Rs. 1.00

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

1st October 2013

মূল্য ঃ ১টাকা

Special Issue

Vol : II Issue : VII আশ্বিন ১৪২০, বার্ষিক মূল্য-১০টাকা RNI No WBBEN/2012/46375

ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুন

বেথুন ইন্সটিটিউট

অফ

জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ

এন্ড

রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার-এর

বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস উপলক্ষে

বিশেষ সংখ্যা

সূচীপত্র

১। শুভেচ্ছাবার্তা

২। প্রবীণদের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসুন — পেলব মুখার্জী

৩। বিশ্ব প্রবীণ দিবস — ডাঃ গৌরীপদ দত্ত

৪। শততম জন্মবর্ষে জ্যোতি বসু — দীপেশ মিত্র

৫। প্রবীণ নাগরিক প্রসঙ্গে কিছু অনুভূতি ও ভাবনা — লীলা পুরকায়স্থ

৬। জ্যোতি বসুর মানবধর্ম — রামরমন ভট্টাচার্য

৭। বয়স্ক কল্যাণ কিছু তথ্য — অশোক রঞ্জন ধর

৮। দিগন্ত রেখা — জয়ন্ত কুমার ভট্টাচার্য

৯) বিশ্বের অন্যতম ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র দেশ ভারতের 'ইন্ডিয়ান' নেতা নেত্রীরা গণতন্ত্রী ? — অধ্যাপক (ডাঃ) জ্ঞানব্রত শীল

১০) কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায় স্মরণে — রমা প্রসন্ন দত্ত (প্রবাসী)

১১) বয়স্ক বন্দনা — ডাঃ গৌরীপদ দত্ত

১৩) প্রবীণ কণ্ঠ — প্রশান্ত কুমার ধর

বিঃদ্রঃ এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে লেখকের নিজস্ব অভিমত। সম্পাদক কোনমতেই দায়ী নয়।

M. K. Narayanan
GOVERNOR OF WEST BENGAL

RAJ BHAVAN
KOLKATA 700 062

11th September, 2013

I am glad to learn that Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre, in collaboration with Jay Engineering of Workers' Union, is celebrating the World Senior Citizens' Day on 1st October, 2013.

I am sure the Institute will continue serving the geriatric population and provide them the best healthcare available.

I wish the celebration all success.

M. K. Narayanan

DR. SURJYA KANTA MISHRA
LEADER OF THE OPPOSITION

OFFICE :
Legislative Assembly
West Bengal
Kolkata
Phone : 2248-2233 Fax : 2248-9469
RESIDENCE :
B, 10, Kareya Housing Estate
98, Kareya Road
Kolkata-700 019
Phone : 2280-0808

Date ....
September 19,2013

MESSAGE

I feel happy to note that the Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre is going to celebrate the World Senior Citizens Day on 1st October, 2013.

I hope the efforts of this organisation for rendering assistance to the Senior Citizens, particularly from weaker section of the society will go a long way in future.

Wishing the programme a grand success.

(Surjya Kanta Mishra)

Shri Pelab Mukherjee,
President,
Bethune Institute of Geriatrics Research and Rehabilitation Centre,
392A, Prince Anwar Shah Road,
Kolkata – 700 045.

প্রবীণদের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসুন

পেলব মুখার্জী
সভাপতি

আজ বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবসে সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। সারা দুনিয়া জুড়ে প্রবীন মানুষদের কল্যানের জন্য বিভিন্ন সংগঠন কাজ করে চলেছে, আমাদের দেশ ভারতবর্ষের সরকারেরও ঘুম ভেঙেছে বলে মনে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারি ভর্তুকি ও অনুদান সরকার দিয়ে থাকেন কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু ? প্রবীণদের সমস্যা সামাজিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক দিক থেকে অসমতাই প্রধান বলে মনে হয়, তা কাটিয়ে তোলার জন্য নানাভাবে নানা সংগঠন কাজ করে চলেছে। কেউ শুধু মাত্র প্রবীণদের বিনোদনের জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান পালন করেন, কেউ বা প্রবীণদের শুধুমাত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু সাহায্য করার চেষ্টা করছেন, কেউ বা প্রবীণদের বাস সমস্যা দূর করার জন্য চেষ্টা করছেন কিন্তু এই বিশাল দেশের প্রয়োজন অনুপাতে তা খুবই সামান্য।

আমাদের সংগঠন চিকিৎসা, আমোদ-প্রমোদ, আলোচনা সভা, বিনোদনের ব্যবস্থা, বনভোজন ইত্যাদি নিয়মিত করে প্রবীণদের পাশে সাধ্যমত দাঁড়ানোর জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু এটা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, আমরা চাইলেই বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারি না। সেইজন্যে প্রয়োজন নিরন্তর প্রচার ও সচেতনভাবে চেতনার বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া কিন্তু তা করতে গিয়ে আমরা দেখছি মুখে অধিকাংশ লোক প্রবীণদের প্রতি সহানুভূতি দেখালেও প্রবীণদের কল্যাণে এগিয়ে এসে কাজ করার ক্ষেত্রে অধিকাংশই রাজী নন। বিশেষ করে স্বার্থ সচেতন করার জন্য দু-চারটি বক্তৃতা, আলোচনা সভায় উপস্থিত করলেও এমনকি নিয়মিত চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য এগিয়ে আসতে সকলের রাজি নয় বলে মনে হয়। এটা মনে রাখতে হবে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে প্রতিনিয়ত। একমাত্র প্রবীণরাই পারেন নিজেদের জীবনের সমস্যা তুলে ধরে তা প্রতিকারের জন্য এগিয়ে আসতে যৌবনে নানা পেশায় কর্মরত বিভিন্ন অংশের মানুষ একসূত্রে প্রবীনত্ব লাভ করেও তাদের সমস্যা সম্পর্কে কেউ কেউ উদাসীন থাকলেও অধিকাংশই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আগ্রহী। তাই আজ বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবসে আপনাদের সকলকে প্রবীণ মানুষের কল্যানের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

শততম জন্মবর্ষে জ্যোতি বসু

দীপেশ মিত্র

সম্পাদক

৮ই জুলাই ২০১৪ তারিখে জ্যোতি বসুর শতবর্ষ পূর্ণ হবে। এক বছর ধরে তাঁর জীবন, সংগ্রাম, দর্শন এবং সৃষ্টিকর্ম নিয়ে চলবে আলোচনা, সভা, সমিতি, গবেষনা, তার সম্পর্কে পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ ইত্যাদি। জ্যোতি বসুর শতবর্ষ উদযাপনকে উৎসব নয় একটি সংগ্রাম হিসাবে বিবেচনা করা হবে। এই উপলক্ষ্যে বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনের খেমকা হলে গত ১২ই আগষ্ট জ্যোতি বসুর সেন্টার ফর সোস্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ এর পক্ষ থেকে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছিল। উক্ত সভায় গঠিত হয়েছে শর্তবর্ষ উদযাপন কমিটি। এই কমিটির সভাপতি হয়েছেন বামপন্থী আন্দোলনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা অশোক ঘোষ, কার্যকরী সভাপতি হাসিম আব্দুল হালিম, সম্পাদক বিমান বসু কোষাধক্য সুখেন্দু পানিগ্রাহী। সভাপতি হিসাবে আছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, গুরুদাস দাশগুপ্ত, সূর্যকান্ত মিশ্র, নিরুপম সেন, সৌরভ গাঙ্গুলী, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, ওয়াসিম কাপুর, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, সমরেশ মজুমদার, শ্যামলী গুপ্ত প্রমুখ আরও অনেকে। উপদেষ্টা মন্ডলীতে আছেন অর্মত্য সেন, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল সেন, শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণা ধর, অশোক মিত্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পি.কে ব্যানার্জী, ডাঃ মনি ছেত্রী, শোভা সেন, দেবেশ রায়, হোসেনুর রহমান, শংকর সেন, অজয় চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার, অপর পাল, পি.সি. সরকার, নবীনতা দেবসেন সহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

জন্মশতবর্ষ আমাদের কাছে সুযোগ এনে দিয়েছে তাঁর মতাদর্শ, বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সম্পর্কে যে পথ তিনি নির্দেশ করে গেছেন তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা।। জ্যোতি বসু ছিলেন প্রকৃত রাষ্ট্র নায়ক। একটি বিশেষ দলের সদস্য হয়েও তিনি সমস্ত মেহনতি মানুষের নেতা।

প্রবাদপ্রতিম জননেতা জ্যোতিবসু রবীন্দ্র নাথের মতোই বিশ্বাস করতেন মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। জীবনের শে, দিন পর্যন্ত বলেছেন "মানুষের কাছে আমাদের যেতে হবে, মানুষের আস্থা অর্জন করত হবে। মনে রাখতে হবে- মানুষই ইতিহাস রচনা করে।" আমরা বিশ্বাস করি জ্যোতি বসুর জীবনাদর্শ সকল শোষিত মানুষের কাছে সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

জ্যোতি বসুর মানবধর্ম

রামরমণ ভট্টাচার্য

ঈশ্বর নিরপেক্ষ মানবতাবাদ এবং ব্যক্তিগত সম্পদ নিরপেক্ষ মানবতাবাদের সাধনায় জ্যোতি বসু আমাদের যুগে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রয়োগসিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু তাঁর বিশাল রাজনৈতিক সংগ্রাম সাফল্যের বর্ণচ্ছটায় এই দিকটি প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায়। ভারতবর্ষে থাকাকালীন ছাত্রাবস্থায় সাম্রাজ্যবিরোধী স্বদেশপ্রেমের পরিমন্ডল পারিবারিকভাবেই তিনি পেয়েছেন। এসব ঘটেছে তাঁর বাল্য ও কৈশোরে। ইংলন্ডে ব্যরিস্টারি পড়তে গিয়ে তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন এবং সাংগঠনিকভাবে ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। তারপর থেকে আদ্যান্ত তিনি নিজেকে একজন কমিউনিস্ট হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন।

মার্কসবাদী আর কমিউনিস্ট এককথা নয়। একজন মার্কসবাদী মার্কসের শ্রেণিশোষণ ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের তত্ত্বে আস্থাশীল হতে পারেন। তিনি শোষণমুক্ত সমাজ চাইতে পারেন। পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের পর পর উদ্বৃত্ত মূল্যের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে আসুক এমনটাও দাবী করতে পারেন। এই দাবীর অন্তরালে একটি মানবপ্রেম এবং সামাজিক সত্তা যে কাজ করে তাতেও সন্দেহ নেই। তবে এই মানবপ্রেম ঈশ্বর নিরপেক্ষ মানবতাবাদ থেকে উৎসারিত নাও হতে পারে। অখণ্ড ঈশ্বরপ্রেম ও অনুরাগ থেকে একজন সৎ মানুষ কল্যাণধর্মে ব্রতী হতে পারেন - হয়েও থাকেন। স্বার্থমগ্নতার জাল ছিন্ন করে বৃহৎ মানব সমাজের অধিবাসী হবার এই সাধনা চলে আসছে বহু শতবর্ষ ধরে।

''মানুষের জীবন এক পক্ষে পশুর জীবন। অন্যকে বঞ্চনা করিয়া সে নিজের স্বার্থ সাধন করে। পরের জীবন নষ্ট করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করে। স্বভিন্ন পরকে আত্মস্থ করিয়া নৈসর্গিক উপায়ে চর্বণ করিয়া, উদরসাৎ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। তাহার নিকট 'স্ব' এর মতো, 'অহং' এর মতো প্রিয় কিছুই নাই। কিন্তু যদি তাহার 'স্ব' কে 'অহং' কে 'মেত্ত' বা মৈত্রীভাগের দ্বারা ক্রমে পরের সহিত বস্তুবিশ্বের সহিত মিলাইয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে .... আর পর বলিয়া কিছু থাকে না। মানুষের স্ব বা অহং যদি আপনাকে আপনার সন্তানকে, আপনার দলকে, আপনার দেশকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করে তাহা হইলেই মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশ হয়'' (দক্ষিণারঞ্জন মিত্র : চার্বাক দর্শন পৃ. ১১)।

'মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশ' এর জন্য বিশ্বের সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলি সমানভাবে উদ্যোগী। এই ক্ষেত্রে একের সঙ্গে অন্যের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। বৌদ্ধ ধর্মের মানবতা, হিন্দুর একাত্মতা কিংবা খ্রিস্টান ও ইসলামের বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ব সর্বজনবিদিত। তবু মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রার্থিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। অর্জনের পথে প্রবল বাধা জাতি-বর্ণ-ভাষা-ধর্ম-রাষ্ট্র ইত্যাদির বিরোধ। এইসব বিরোধ বিভাজন অতিক্রম করার জন্য বহু নীতিতত্ত্বের উদ্ভব ও অনুশীলন হয়েছে। এই অনুশীলনের পথে সব থেকে বড় বাধা কোথা থেকে আসছে?

মার্কস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন প্রধান এবং একমাত্র বাধা ধনতন্ত্র। ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার সৃষ্টি করে ধনতন্ত্র অন্য সকল মানবিক অনুভূতিগুলিকে নিষ্পেষিত করেছে। স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। মার্কস বলেছেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি আমাদের এমন মূঢ় ও একদেশদর্শী করে রেখেছে যে কোন বস্তু তখনই আমাদের হয় যখন আমরা সেটি অধিকার করি অর্থাৎ যখন সেটি আমাদের পুঁজি হিসেবে থাকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির দৃষ্টিতে অধিকারের এই প্রত্যক্ষ রূপগুলিকে জীবনধারণের উপায় বলে মনে করা হলেও এগুলি যে জীবনের উপায় সে জীবন হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জীবন অর্থাৎ কাজ ও পুঁজি। সুতরাং অতি সহজভাবেই এইসব অনুভূতির বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং অধিকারবোধ সমস্ত দৈহিক ও অশরীরী অনুভূতির স্থান দখল করেছে। মানবিক অস্তিত্বকে তার চরম দৈন্যের অবস্থায় টেনে আনা হয়েছে তার আভ্যন্তরীণ ঐশ্বর্য সৃষ্টি করার জন্য।" (সমাজতন্ত্রী মানবতাবাদ : কার্লমার্কস)।

ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য তিনটি পথের একটি গ্রহণ করতেই হবে; দৈহিক শ্রম বিক্রী, মেধা বিক্রী অথবা ব্যক্তিগত সম্পদকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করা। আর যা বাকি থাকে তার নাম চৌর্যবৃত্তি-সাধারণভাবে প্রতিটি সমাজবদ্ধ মানুষ এ পথে চলতে চায় না। এই কারণে সম্পদ সংগ্রহের প্রবল প্রয়োজন তাকে একমুখী করে তোলে। একমুখিনতার তাড়নায় অন্য আবেগ-অনুভূতির অনুশীলন স্তব্ধ হয়ে যায়। মনুষ্যত্বের মুক্তির প্রাথমিক শর্ত হলো ব্যক্তিগত সম্পদের উচ্ছেদ। তিনি দ্বার্থহীন ভাষায় বলছেন। "ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদের অর্থ সকল মানবিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও মানবিক প্রবণতার সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ। কিন্তু মুক্তি শুধু এই কারণেই যে এই ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রবণতাগুলি বস্তুগত ও বস্তুনিরপেক্ষ উভয়ভাবেই মানবিক" (ঐ, সাহিত্য ও শিল্পকলা প্রসঙ্গে মার্কস এঙ্গেলস লেনিন পৃ. ৫১)।

জ্যোতি বসুকে আমরিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ১লা জানুয়ারী ২০১০ এ। পাঁচজন বিশিষ্ট চিকিৎসককে নিয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল সেইদিনই। বোর্ড পরীক্ষা করে বুঝেছিল জ্যোতিবসু মৃত্যুকে প্রায় সঙ্গী করে হাসপাতালে এসেছেন। জ্যোতি বসুও অনুভব করেছিলেন তিনি মৃত্যুর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছেন। পাঁচ-ছয় তারিখ পর্যন্ত তার চেতনা কাজ করেছে। সেইসময়ে কখনো ইঙ্গিতে কখনো অস্পষ্ট ধ্বনিতে কখনোবা চিরকুটে লিখে তাঁর নিত্যসঙ্গী জয়কৃষ্ণ ঘোষের কাছে তাকে বাড়ি নিয়ে যাবার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন।

মৃত্যুর আগে বিশেষ করে প্রবীণ প্রবীণারা জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি গ্রহণ করতে চান প্রিয় পরিবেশে প্রিয়জন পরিবেষ্টিত হয়ে। এই আবেগ সৃষ্টি হয় অত্যন্ত সমৃদ্ধ মানবিক চেতনা থেকে। কিন্তু কোন 'বাড়িতে' তিনি যেতে চেয়েছিলেন? নিশ্চিতভাবে জানা গেছে তাঁর হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে নয়। অথচ ওই বাড়িটি তাঁর পৈতৃক সম্পদ, দীর্ঘজীবন অতিবাহিত হয়েছে সেই বাড়িতে। যেতে চেয়েছিলেন জীবনের প্রায় শেষ এক দশক যেখানে কাটিয়েছেন সেই ইন্দিরা ভবনে। ইন্দিরা ভবন সরকারী আবাস। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ নয়।

কখনো তিনি চাননি এই বাড়িটি তাঁর নামে হোক অথবা মৃত্যুর পর তার স্মৃতি সংগ্রহশালা হিসেবে নামান্ত হোক, অথচ চাইলে তিনি যথেষ্ট সম্পদ, প্রতিষ্ঠা,প্রতিপত্তি এসব পেতে পারতেন।

জ্যোতি বসু নিরাসক্ত ছিলেন নিজের সুখ-সম্ভোগ সম্পর্কে। কিন্তু দেশ ও জাতির সম্পদবৃদ্ধির প্রশ্নে আসক্তি ছিল সাধারণের থেকে অনেক বেশি। গরীব কৃষক জমির মালিকানা পাক, ফসলের ন্যায্য দাম প শ্রমিক কারখানায় নিরাপত্তা পাক, দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করে ওপরে আনা হোক ইত্যাদি দাবী পূরণের জন্য তিনি বামফ্রন্টের প্রধান ঋত্বিক হিসেবে যা কিছু দরকার সব করেছে করেন নি কেবল নিজের জন্য। ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর প্রবল অনীহা ছিল। তিনি বাড়ি ক নি গাড়ি করেন নি। তাঁর সঞ্চয় নেই, জীবনবীমা নেই। সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন চেয়ে কানাকড়ি বেশি সমাজ, পার্টি বা সরকার থেকে কখনো দাবী করেন নি। পেলেও স্বভাব সু নিরাসক্ততায় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তবু তিনি ইন্দিরা ভবনে যেতে চেয়েছিলেন। মৃত্যু আসছে, আসুক, তার হাত অবশ্যই ধরতে হবে। আগে প্রিয় পরিবেশ পরিচিত প্রিয়জনের, জীবনের উষ্ণতার ইন্দ্রিয়ানুভূতি শেষবারের মতো অনুভব ক চেয়েছিলেন। জ্যোতি বসুর এই মর্তপ্রেম, এই ইহবাদ কমিউনিস্ট জীবনাচরণের একটি ঐতিহাসিক উপাদ

জ্যোতি বসুর পার্টির প্রতি দায়বদ্ধতা, তাঁর শৃঙ্খলাপরায়নতা, কমিউনিস্ট নৈতিকতা বহু আলোচিত। ইং শব্দ ব্যবহার না করে অনর্গল বাংলা বলে যাওয়া, তাঁর পোশাক, আচার-আচরণ, তাঁর বাচনভঙ্গী চরিত্রকে এক বিশিষ্ট বাঙালিয়ানার স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর গভীর ভারত বোধ দলমত নির্বিশেষে শ্রদ্ধার বিষয়। কিন্তু একনিষ্ঠ পার্টিজানশিপ, বঙ্গপ্রীতি অথবা ভারতীয়ত্ব বিশ্বমানব বিশাল প্রাঙ্গণে পৌঁছানোর পথে কখনো অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। বরং এগুলি উত্তরণের সোপান হিসাবে করেছে জ্যোতি বসুর জীবনে।

জ্যোতি বসুর মানবতাবাদের উৎসে ঈশ্বর নেই সেকথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ঈশ্বর নির মানবতাবাদের দর্শন তিনি গ্রহণ করেছেন মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ থেকে এবং প্রয়োগও করেছি সেইপথে। তিনি সমাজতন্ত্রের দীর্ণ যুগে জন্মগ্রহণ করেন নি। বিপরীতে সমাজতন্ত্রের স্বর্ণযুগেই তাঁর রাজনীতি অনুপ্রবেশ। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ এই সময়কালে প্রবাসের ছাত্রজীবনে যেমন দেখেছেন ধনতন্ত্র, সাম্রাজ এবং ফ্যাসীবাদ এর নগ্ন নখদন্ত, তেমনি প্রত্যক্ষ করেছেন সমাজতন্ত্রকে বাস্তবায়িত করার বিপুল সং পাশ্চাত্য সমাজের বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিবাদ, একনিষ্ঠ আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। বারটান্ড রাসেল, রমাঁ রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, অরি বারবুজ প্র মনীষীদের মানবতাবাদকে তিনি সমগ্র মানবজাতির ঐতিহ্য হিসেবে আত্মস্থ করেছিলেন। 'যতদূর পড়ে' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ''স্পেনে শুরু হয়েছে গৃহযুদ্ধ। ফ্রাঙ্কোর স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রীদের সং

নজর কাড়ছে সমস্ত প্রগতিশীল মানুষের। ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তার এই যুদ্ধে সামিল হতে গড়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক ব্রিগেড। রালফ ফক্স ', ক্রিস্টোফার কডওয়েলের মতো বিখ্যাত কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা স্পেনে যেতে শুরু করেছেন। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের উপন্যাস 'ফর হুম দি বেল টোলস' এই সংগ্রাম নিয়েই লেখা। আমি ভিতরে বিথরে প্রবল আলোড়িত। (ঐ - পৃ. ৮)।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং জীবনাদর্শ তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদকে পুষ্ট করেছিল। কিন্তু দেশজ উপাদানও কম ছিল না। একথা সত্য প্রাচ্য সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনাচরণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তবু মনে রাখতে হবে বিদ্যাসাগর এই সমাজেই জন্মেছেন এবং মার্কসবাদ নিরপেক্ষভাবে বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত চেতনায় ইহবাদী মানবধর্মের যে প্রবল প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন হলফ করে বলা যায়, সে প্রেরণা ধর্মবিশ্বাস থেকে আসেনি। তাঁর মানবধর্মের উৎস রামমোহন অথবা রামকৃষ্ণ কারও জীবনদর্শনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুঁজে পাওয়া যাবে কয়েক দশক পরে অনুশীলিত জ্যোতি বসুদের জীবনাচরণে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগরচরিত' প্রবন্ধে লিখছেন : "বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয় যে ... তিনি যে রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে - তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়"।

জ্যোতি বসুর যুগে মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের গৌরব ছিল না। তিনি একা নন, ছিলেন তাঁর অনেক সহযোদ্ধাও। ছিল ঈশ্বর সাপেক্ষ কিন্তু সম্পদ নিরপেক্ষ মনুষ্যত্ব সাধনার লালন ফকির তথা বাউল চর্চিত একটি লোকায়ত ধারার ঐতিহ্যও। ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সর্বত্যাগী ধারার অনুশীলন। এই দুই ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যুক্তিবাদী, বিজ্ঞাননিষ্ঠ মার্কসীয় আধুনিক মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদ ব্যক্তিবিশেষের সাধনার পরিবর্তে একটি সংগঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মঞ্চ নির্মাণের সক্রিয় হয়ে উঠেছিল জ্যোতি বসুর যুগে। ব্যাপক অর্থে জ্যোতি বসুও কালের রাখাল। তিনি নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে খণ্ডিত কালকে কালান্তরের পথে যাত্রা করিয়ে দিয়েছেন।

জ্যোতি বসুর মৃত্যুর পর বিগত কয়েকমাসে অনেক কবিতা প্রকাশ হয়েছে। বড় পত্রিকায়, ছোট পত্রিকায়, প্রতিষ্ঠিত কিংবা অখ্যাত কবির দৃষ্টিতে উঠে এসেছে বিভিন্ন মূল্যায়ন (দ্রষ্টব্য নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মুখপত্র শিক্ষা ও সাহিত্যের মার্চ ২০১০ সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা)। এক কবির কথায়, জ্যোতি বসুর জীবন 'সংগ্রামের প্রবাহের তরঙ্গে যেন এক ইস্তাহার।'

আর এক কবি বলেছেন :

একজন বিদ্যাসাগর মানে
তিমিরবিনাশী জ্ঞানের মশাল

প্রজ্জ্বলন।

একজন রবীন্দ্রনাথ মানে

প্রজ্জ্বলিত মশালের বহুধা

বিচ্ছুরণ।

একজন জ্যোতি বসু মানে

বিচ্ছুরিত আলোর উত্তাপ সর্বত্র

বিতরণ।

বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের সমাসনে জ্যোতি বসুকে বসানোর আবেগকে বালখিল্যের উম্মাদনা বলে উপেক্ষা করবেন অনেকে। মতাদর্শগতভাবে তাঁর প্রতিপক্ষরা বিরোধিতাও করবেন। যতদূর মনে পড়ে ১৮ই জানুয়ারী কোনো প্রভাতী দৈনিকে জ্যোতি বসু সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত হয়নি। কিন্তু তার পরদিন থেকেই শুরু হয়ে যায় তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্টক টেকিং। একটি সংবাদপত্রের একজন সাংবাদিক রীতিমত অঙ্ক কষে প্রমাণ করে দিয়েছেন, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুরা জ্যোতি বসুকে কেন মানবতার শত্রু বলে মনে করে। অন্য একটি বহুল প্রচারিত দৈনিকের মালিক নিজেই কলম ধরে প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে জ্যোতি বসুর সাফল্য ব্যর্থতা নয় তাঁর যোগ্যতা অযোগ্যতার হিসেব নিকেশ করেছেন। তিনিও দক্ষতার সঙ্গে প্রমাণ করে দিয়েছেন, জ্যোতি বসু পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে অযোগ্য প্রশাসক। ঠিক যেটুকু সাফল্য অর্জন করেছেন তাও সম্ভব হয়েছে তাঁর পার্টি এবং বামফ্রন্টের জন্য। আবার একই সংবাদপত্রে অন্যদিন, অন্য কেউ লিখেছেন, বামপন্থী রাজনীতিতে জ্যোতি বসু একজন ব্যতিক্রমী মহানায়ক। এই অনন্য প্রতিভার কোনো উত্তরসূরী নেই। তাঁর মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা কোনোদিন পূরণ হবে না।

জ্যোতি বসুর নিন্দা কিংবা বন্দনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেনি। একটি সুচতুর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে প্রচারগুলি হয়েছে এবং এখনো হবে ভবিষ্যতেও হবে। এই পরিকল্পনার একমাত্র লক্ষ্য জ্যোতি বসুর শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজগঠনের সংগ্রাম, তাঁর নিরীশ্বরবাদী জীবনদর্শনের প্রয়োগনিষ্ঠা এবং পরিপূর্ণ মানবতার জন্য আজীবন সাধনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তি হিসাবে তাঁকে চিত্রিত করা। বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রচারক কলমজীবীরা ব্যক্তিকে সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রতিভার পোস্টমর্টেমের পশরা সাজিয়ে বসেন। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর একটি দৈনিক পত্রের কর্তৃপক্ষ দেশী বিদেশী অনেক পন্ডিত জড়ো করেছিলেন এই সমাজের উত্থান ও পতনের কারণ অনুসন্ধানের জন্য। তাঁরা অনেক গবেষণার পর সিদ্ধান্ত এসেছিলেন রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্তরালে শ্রেণিদ্বন্দ, শ্রমিকশ্রেণি অথবা বলশেভিক পার্টির ভূমিকা ইত্যাদি এই সবের কোনো ভূমিকা ছিল না। এ বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র

লেনিনের 'অলৌকিক' প্রতিভার কারণে। এমন রাজনৈতিক প্রতিভা হাজার বছরে মানব সভ্যতা একবারই পেতে পারে। অর্থাৎ আগামী হাজার বছরে কোনো দেশেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ভগবান ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না যে সংবাদ পত্রটি, তারাও বলেছে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে জ্যোতি বসুর ক্ষুরধার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার কারণ হিসেবে। জ্যোতি বসু নেই বামফ্রন্টও থাকবে না। অথচ আদর্শায়িত জনচিত্তের যে মঞ্চে জ্যোতি বসুর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে সেটা তো ভাঙা যাবে না। বরং কালের যাত্রাপথে সে মূর্তি আরও বহত্ব এবং বিশালত্ব অর্জন করবে। সর্বকল্যাণকামী বিমূর্ত মানবতার এই মূর্তি নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন কার্ল মার্কস।

জ্যোতি বসু তাঁর দুটি চোখ আগেই দান করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে অবসর গ্রহণের পর দেহদান করেন। দানপত্রে স্বাক্ষর করার সময় বলেছিলেন: ''মৃত্যুর পরেও একটা মানুষের দেহ অন্য মানুষের কাজে লাগে বিষয়টা তেমনভাবে উপলব্ধি করিনি, এটা আমার ব্যর্থতা ... কমিউনিস্টরা যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন মানুষের জন্য কাজ করে যায়।'' চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের জন্য জ্যোতি বসুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অস্থি এখনো কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর মস্তিষ্ক সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে মানুষের প্রয়োজনে সমাজের প্রয়োজনে।

১৮৮৩ সালের ১৭ই মার্চ মৃত্যুর ঠিক পূর্বে কার্ল মার্কস কনিষ্ঠা কন্যা এলিনর এবং পরিচারিকা ডেমুথের সাহায্য নিয়ে দোতলায় তাঁর প্রিয় আরাম কেদারায় শুয়েছিলেন। এঙ্গেলস প্রতীক্ষা করছিলেন নীচে। মাত্র দুমিনিটের ব্যবধানে ওপরে উঠে এসে এঙ্গেলস দেখেন মার্কসের ধমনীর স্পন্দন এবং শ্বাসক্রিয়া স্তব্ধ। থাক সে কথা। সেদিন হাইগেটে সমাধিস্ত করার পর এঙ্গেলস বলেছিলেন: ''তাঁর সময়ে মার্কস ছিলেন সব থেকে বেশি ঘৃণিত ও কলঙ্কভাজন ব্যক্তি। স্বৈরতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী সব সরকারই নিজ নিজ অঞ্চল থেকে তাঁকে নির্বাসিত করেছে। রক্ষণশীল বা অতি গণতন্ত্রী সব বুর্জোয়া সমাজই পাল্লা দিয়ে তাঁর উপর বর্ষণ করেছে কুৎসা। তিনি এসব কিছুকে মাকড়সার জালের মতো দূরে ঠেলে দিয়েছেন, অবজ্ঞা করেছেন, একান্ত বাধ্য হলে তবেই উত্তর দিয়েছেন। এবং তিনি ভালোবাসা পেয়েই মারা গেলেন - সাইবেরিয়া থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার খনি অঞ্চলের ইউরোপ ও আমেরিকার লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী শ্রমজীবী সাথীদের কাছ থেকে সম্মান ও শোকানুভূতি তিনি লাভ করলেন। এবং আমি দৃপ্ত কণ্ঠেই বলতে পারি, তাঁর বহু বিরোধী থাকলেও ব্যক্তিগত শত্রু ছিল না একজনও। তাঁর নাম যুগ যুগ যুগধরে বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকবে তেমনি তাঁর কাজ'' (কার্ল মার্কস : রঞ্জিত চক্রবর্তী পৃ. ২৮৬)।

মার্কস সম্পর্কে এঙ্গেলস-এর মূল্যায়ণ পড়তে পড়তে স্মৃতিপটে জ্যোতি বসুর মুখ ভেসে ওঠে নিতান্তই বস্তুগত ঐক্যের কারণে। জ্যোতি বসুর সঙ্গে কার্ল মার্কসের তুলনা করার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। জ্যোতি বসু বিশেষ প্রতিভাবান কিন্তু তিনি এক ও অনন্য নন। দীর্ঘকালব্যাপী তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্ব, পরাধীন ও স্বাধীন দুই ভারতেই তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, পার্টির নির্দেশে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ এসব নিতান্তই স্থানিক

এবং কালিক তথ্য। জীবনাদর্শের অনুশীলনের ধারাবাহিকতাতেও তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব নন। আরও অ ছিলেন তার সময়ে এখনো আছেন। তাঁর দলের ওপর তলার নেতৃত্বের মধ্যে যেমন নীচের তলার সাধারণ কর্মীদের মধ্যেও তেমনি আছেন অনেকে। অন্য দলে এবং ভিন্ন দলেও ঈশ্বর নিরপেক্ষ মান সাধক সৃষ্টি হয়েছে বিস্তর। এই সাধকরা একটি নিতান্ত আদি অথবা মধ্যযুগীয় ঈশ্বর বিশ্বাস বিরোধী বা সম্প্রদায় নয়। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এসে ঈশ্বর নিরপেক্ষ মানবতার সাধনায় বাঙালীর জ চরিত্রের নতুন অভিমুখ সৃষ্টি হয়েছে। এই সাধনা বহুজনের সংগ্রামী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

জ্যোতি বসুর সাফল্য - এই শক্তির ওপর তিনি কখনো বিশ্বাস হারান নি। তিনি বেঁচে থাকবেন এই শ অন্যতম ভরকেন্দ্র হিসেবে।

বয়স বন্দনা

গৌরীপদ দত্ত

বন্ধু বীরেন বল্লে বয়স বিরাশী
বার্দ্ধক্যে বড়ই জ্বালা বিপদ বহুত।
কানেতে শুনিনা ভাল, চোখে দৃষ্টি কম।
শুনে বলি জীবনের এটাই নিয়ম।
বিজ্ঞানীরা নিত্যসৃষ্টি করে বলে
নতুন যন্ত্রের। দেহের সকল পার্টস
বদলানোর প্রচেষ্টা অঢেল।
কতদিন চলবে আর বহুলক্ষ
বছরের আগে সৃষ্ট ঈশ্বরের
আশ্চর্য মডেল?
তবু ডারউইন তত্ত্ব প্রকৃতি নির্মাণে
মানুষ বেঁচেই আছে নানা বিবর্ত্তনে।
বলি তাই মেনে নাও এসব দুর্দৈব!
ঘটবে যা ঘটবেই ঠিক এই ভবিতব্য।
বলাটা সহজ খুব মানাই কঠিন।
অপেক্ষা করেই থাকা শেষের সেদিন।

প্রবীন কন্ঠ

প্রশান্ত কুমার ধর

প্রবীণদের দুঃখের কথা বলবো কি আর ভাই,
অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা, তাঁরা ছাড়া আর কেহ নাই,
অনিচ্ছা সত্ত্বেও, বড় অংশে বাধ্য হন উপার্জনে
দুঃখ পান, কষ্ট পান, আসে যখন চিন্তা মনে।
একান্নবর্তী পরিবারে ছিল কত শান্তি,
ছিল সম্মান, ছিল একাত্ব বোধ, সম্পর্ক ছিল গভীর
ছিল দায়বদ্ধতা, বয়স্কদের প্রতি,
এটাই ছিল স্বাভাবিক রীতি।
এখন প্রায় নেই কোথাও তা,
দায়িত্বভারের বালাই নেই,
নিজ পরিবার নিয়ে থাকে সুখে,
মা বাবার খোঁজ নাই।
করেছি বড়, পাল-পোষ করে,
যতদিন না স্বক্ষম উপার্জনে,
ভুলে যায়, দায়িত্ব নিতে।
যখন তাঁরা হয়ে পরে নিঃস্ব, সমস্ত দিক থেকে।
না খুঁজে পায় কোন যুক্তি
না থাকে বল, না থাকে বুদ্ধি,
মুখ ফিরিয়ে নেয় সন্তান,
দুঃখই হয়, সারা জীবনের সমস্ত সমাধান।
ব্যস্ত থাকে নিজেদের নিয়ে, মা-বাবা কেহ নয়,
বিসর্জন দেয় নীতিবোধ, ভাবে না তাঁদের নিঃসঙ্গতা,
মানতেই হবে, এটাই তাদের
প্রবীণদের প্রতি তাচ্ছিল্যতা।
মৌলিক প্রশ্ন নীতির, বুঝবে কি তারা?
মা-বাবার দায়িত্ব বোধের হিসেব দেবে কারা?
বুঝবে একদিন, কি করেছি, ভুল না ঠিক
প্রৌঢ়ত্ব আসবে যখন, মিলে যাবে ব্যাল্যান্স শীট।